**উজ্জ্বল হালদার**

সহকারী শিক্ষক

৮১নং দঃ মাটিয়ারগাতী স.প্রা.বি.

**বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা**

পৃথিবীর বিকাশ আর বিবর্তনের ধারায় যুগে যুগে বিবিন্ন মনিষী তাদের চিন্তা ও ধ্যান ধারনা দ্বারা মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে পরিচালিত করে পৃথিবীকে আরো সুন্দর আর মানব জাতিকে সভ্যতার শিখরে পৌছাতে অবদান রেখে গেছেন। তাদের এই অবদানের জন্য তারা আজ মানুষের মাঝে মৃত্যুহীন প্রাণ রূপে অমর হয়ে আছেন। কখনো কখনো কেউ কেউ কাণ্ডারির মতো শোষকদের থেকে শোষিতদের মুক্তির বারতা নিয়ে জ্ঞানের আলো বিতরণ করে নিপীড়িত মানুষের বোধশক্তিকে জাগ্রত করে তাদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন। বাঙালি জাতি হিসেবে আমরাও গর্বিত এমন এক মহান নেতা পেয়েছিলাম যিনি সাধারণ খেঁটে খাওয়া মানুষের মাঝে অধিকার আর মর্যাদা নিয়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন, যিনি বিশ্ব দরবারে আমাদের বাঙালি জাতি হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজি্বুর রহমান। যার ভাবনা ছাড়া আমরা আজও হয়তো স্বাধীনদেশ পেতাম না। রাষ্ট্র পরিচালনার সব ক্ষেত্রে সকল শ্রেণি পেশার মানুষের প্রতি যার বদান্য দৃষ্টি , তিনিই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধুর শিক্ষা ভাবনা মানবতাবাদ আর মানুষের মুক্তি মন্ত্রে দিক্ষিত এক আলোকিত দেশ গড়ার ইতিহাস। তিনি দেশকে শুধু স্বাধিনই করেন নাই, তিনি মানুষকে স্বাধীনতার সাথে সাথে শিক্ষিত জাতিতে পরিণত করার মন্ত্র দিয়েছিলেন আর সেই লক্ষেই কাজ শুরু করেছিলেন। তাই জাতির পিতার শিক্ষার মূলনীতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে বাঙালী জাতির মুক্তি ও বিশ্ব দরবারে মাথা উচুকরে নিজেদের পরিচয় দেওয়ার ইতিহাস। এই বাংলার মানুষ আর প্রকৃতি ছিলো তার পাঠশালা। শিক্ষাকে তাই তিনি এই সাধারণ মানুষের মুক্তির হাতিয়ার রূপে দেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধু ব্রিটিশদের পশ্চিমা শিক্ষাতত্ত্ব, পাকিস্থানিদের শিক্ষা কমিশনের ষড়যন্ত্র আর মধ্যযুগীয় শিক্ষা ব্যবস্থার বিপরীতে স্বাধীনতার মাত্র ৭ মাসের মাথায় এই দেশে একটা পরিপূর্ণ শিক্ষানীতি দিয়েছিলেন যা ছিলো বাঙালি জাতির মাথা উঁচু করে ভগ্নস্তূপ থেকে ঘুড়ে দাঁড়ানোর এক মৌলিক দর্শন। তার শিক্ষা ভাবনা স্বাধীনতার অনেক আগেই শুরু হয়েছিলো। কারন তিনি জানতেন সঠিক শিক্ষা ছাড়া এই জাতিকে নিজেদের অধিকার বিষয়ে সচেতন করা যাবে না আর তা না হলে মুক্তিও অসম্ভব।

দেশ স্বাধীন হলে যে সংবিধান রচনা করা হয়েছিলো সেখানেও রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশেই তিনি শিক্ষার কথা বলেছেন। শিক্ষার উপর তার বাস্তব পদক্ষেপের প্রথম সাক্ষ্য তিনি রেখেছিলেন প্রথম ঘোষিত বাজেটে। নয় মাসব্যাপি যুদ্ধের পর এই ভগ্ন দেশের পুনর্গঠন যেমন তার কাছে গুরুত্বপুর্ণ তার চেয়ে শিক্ষাই তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো। আর শিক্ষাকে তিনি সার্বজনীন হিসেবেই দেখেছিলেন শুরু থেকে। আর তাই প্রথম বাজেটে দেখি তিনি প্রতিরক্ষা খাতের চেয়ে শিক্ষা খাতে ৩ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা বেশি বরাদ্দ দিয়েছিলেন। শিক্ষার প্রতি তার এই দর্শন জানতে ও বুঝতে আমাদের ফিরে যেতে হবে স্বাধীনতার আগে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের দিকে সেই বছর ২৮ অক্টোবর রেডিও টেলভশনে তার দেওয়া এক ভাষণে তিনি বলেছিলেন, ‘’সু-সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা খাতে পুঁজি বিনিয়োগের চাইতে উৎকৃষ্ট বিনিয়োগ আর কিছু হতে পারে না।‘’ তিনি তার এই ভাষণে ১৯৪৭ সালের পর প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার বিষয়ে শঙ্কা প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, ‘’কলেজ ও স্কুল শিক্ষকদের বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে।“ তিনি তার বক্তব্যে অবৈতনিক শিক্ষার কথাও উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন মাধ্যমিক সিক্ষার দ্বার সবার জন্য খোলা রাখা হবে। তিনি মেডিকেল ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা এবং দারিদ্র্য যাতে উচ্চশিক্ষার জন্য মেধাবী ছাত্রদের অভিশাপ হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন যে শিক্ষা ছাড়া এই অভাগা দেশ ও জাতির গঠন করা অসম্ভব , বাস্তব কারিগরি দক্ষতা ছাড়া অগ্রগতি সম্ভব নয়। তাই তিনি কারিগরি শিক্ষার উপরও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তাই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তার ১৯৭০ সালের বক্তব্যের আলোকে বিভিন্ন যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেন। তার মধ্যে ১৯৭২ সালে প্রনীত সংবিধানের ১৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,

‘’রাষ্ট্র (ক) একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য, (খ)সমাজের প্রয়োজনের সহিত শিক্ষাকে সংগতিপুর্ন করিবার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার উদ্দ্যেশ্য যথাযথ প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছাপ্রণোদিত নাগরিক সৃষ্টি করার জন্য, (গ) আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহন করা।“

প্রাথমিক শিক্ষার উপর বঙ্গবন্ধু সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কারন তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে দেশের আগামী আর শিক্ষার ভিত রচিত হয় প্রাথমিক স্তরেই। তাই তিনি ১৯৭৪ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অধিগ্রহণ আইন, ১৯৭৪ সংসদে পাশ করে দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করেন। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্য উপযোগী সমাজ গঠনমূলক একটি সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রনয়নে ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই ডঃ কুদরত-এ-খুদার নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। স্বাধীনতার মাত্র ৭ মাসের মধ্যে এমন একটি যুগোপযোগী শিক্ষা কমিশন গঠন করে শিক্ষার প্রতি তার আগ্রহের প্রমান দেন। ১৯৭৪ সালে এই কমিশন যে সুপারিশ জমা দেয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুপারিশগুলো হলোঃ

* শিক্ষাখাতে পর্যাপ্ত বরাদ্দ;
* ব্রিত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার;
* নারী শিক্ষায় জোর দেওয়া;
* অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা;

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্টে তার নির্মম হত্যাকান্ডের পর তার প্রদর্শিত পথে শিক্ষাব্যবস্থা আর সেভাবে এগোয়নি, পরবর্তী সামরিক সরকার তার সময়ে গ্রহন করা সকল জনকল্যাণমূলক কজ বন্ধ করে দেয়। আর কুদরত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন কার্যতঃ হিমাগারে চলে যায়। তবে তিনি সল্প সময়ে মানুষের মধ্যে যে শিক্ষার বীজ বপন করে গেছিলেন তা মানুষের মধ্যে বহু গভীরে শিকড় গেড়েছিলো। তার প্রদর্শিত পথের সেই আলো মানষকের আলো দিয়ে তাদের অন্তর আত্মা বিকশিত করেছিলো। তার শিক্ষা ভাবনাগুলো দেশের উন্নয়নে প্রথম ও প্রধান পদক্ষেপ্রুপে তাই আজও আমাদের গর্বিত করে।